ভ্রমণ বৃত্তান্ত

কুন্তল চক্রবতী

ও

সৌম্যজিৎ মন্ডল

ভ্রমণ বৃতান্ত

০৭/০৬/২০২৬

কুন্তল চক্রবর্তী

ও

সৌম্যজিৎ মন্ডল

আমি সৌমজিৎ মন্ডল, স্বজ্ঞানে আমার লেখা শুশুনিয়া ভ্রমনের অভিজ্ঞতাটি আমার বন্ধু, কুন্তল চক্রবর্তীর লেখা "ভ্রমন বৃত্তান্ত" নামক খাতাতে অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি প্রকাশ করছি।

S. Mondal

06/06/08

সূচিপত্র

বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর	লেখকের নাম
• আমার ঘাটশিলা ডায়রি	01	কুন্তল চক্রবর্তী
• আমার দেউঘর ডায়রি	02	
• আমার দেউলটি ভ্রমণ	03	
• স্বচক্ষে শুশুনিয়া দর্শন	04	সৌম্যজিৎ মন্ডল

আমার ঘাটশিলা ডায়েরি

প্রকৃতির কোলে কয়েকটা দিন অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম শহরের এই চেনা ব্যস্ততা আর কোলাহল থেকে দূরে কোথাও একটা শর্ট ট্যুর মারব। তাই গত উইকএন্ডে ব্যাগপত্র গুছিয়ে সোজা রওনা দিলাম ঝাড়খণ্ডের ছোট্ট পাহাড়ি শহর ঘাটশিলার দিকে। সত্যি বলতে, মাত্র দুটো দিন যে এত সুন্দর কাটবে, সেটা ভাবিনি।

যাত্রা শুরু

হাওড়া থেকে সকাল সকাল ট্রেন ধরলাম। ট্রেনের জানলা দিয়ে যখন আস্তে আস্তে কলকাতার চেনা বহুতলগুলো হারিয়ে গিয়ে সবুজ মাঠ আর লাল মাটির রাস্তা উঁকি দিতে লাগল, তখনই মনটা ভালো হয়ে গেল। সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ঘাটশিলা স্টেশনে। স্টেশন থেকে অটো নিয়ে যখন হোটেলের দিকে যাচ্ছি, এখানকার শান্ত পরিবেশ আর দূষণমুক্ত ফুরফুরে বাতাসেই আমার সব ক্লান্তি উধাও হয়ে গেল।

কী কী দেখলাম আর কেমন লাগল

- **গৌরী কুঞ্জ:** ঘাটশিলা যাব আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি দেখব না, তা তো হয় না! তাই শুরুতেই গেলাম 'গৌরী কুঞ্জ'-এ। বিভূতিভূষণের উপন্যাসের আমি মস্ত ভক্ত। যে বাড়িতে বসে তিনি ‘আরণ্যক’ বা ‘পথের পাঁচালী’র মতো কালজয়ী সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে একটা অন্যরকম আবেগ অনুভব করছিলাম।
- **ফুলডুংরি পাহাড়:** বিকেলটা কাটালাম ফুলডুংরি পাহাড়ে। শাল আর মহুল গাছে ঘেরা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে ওপরে ওঠার সময় পাতার খসখস শব্দ আর পাহাড়ি নিস্তব্ধতা দারুণ লাগছিল। ওপর থেকে চারপাশের ভিউটা জাস্ট অসাধারণ!
- **বুরুডি লেক আর ধারাগিরি:** পরদিন সকাল সকাল চলে গেলাম বুরুডি লেকে। চারদিকে পাহাড়, আর মাঝখানে নীল জলের এক বিশাল হ্রদ। এখানে খানিকক্ষণ বোটিং করলাম। বুরুডি থেকে কিছুটা এগিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে খানিকটা ট্রেক করে পৌঁছালাম ধারাগিরি জলপ্রপাতে। পাথরের গা বেয়ে জল পড়ার শব্দ আর চারপাশের ঘন জঙ্গল মিলেমিশে এক মায়াবী পরিবেশ তৈরি করেছিল।
- **সুবর্ণরেখা নদী:** আমার এই ট্রিপের সেরা মুহূর্ত ছিল সুবর্ণরেখা নদীর ঘাটে কাটানো বিকেলটা। নদীর পাড়ে পাথরের ওপর বসে যখন সূর্যাস্ত দেখছিলাম, আকাশ জুড়ে লাল-কমলা রঙের খেলা আর নদীর শান্ত জল দেখে মনে হচ্ছিল, প্রকৃতির চেয়ে বড় শিল্পী আর কেউ নেই।

পেটপুজো

ঘোরাঘুরির পাশাপাশি খাওয়া-দাওয়াটাও জমিয়ে হয়েছে। এখানকার লোকাল হোটেলের বাঙালি থালি যেমন সুস্বাদু, তেমনই এখানকার বিখ্যাত রাবড়ি আর পেঁড়ার স্বাদ এককথায় অপূর্ব! যারা মিষ্টি পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটা স্বর্গ।

আমার দেওঘর ডায়েরি

ভক্তি আর প্রকৃতির মেলবন্ধনে ঘাটশিলার রেশ কাটতে না কাটতেই মনটা চাইল আরও একটা ছোট ট্রিপ দিতে। তাই এবার বেছে নিলাম বাবা বৈদ্যনাথের পুণ্যভূমি দেওঘর। দেওঘর মানেই শুধু পুজো-আচ্চা নয়, এর আশেপাশে লুকিয়ে আছে চমৎকার কিছু পাহাড় আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যা আমার এই ট্রিপটাকে দারুণ মজাদার করে তুলেছিল।

যাত্রা ও প্রথম অনুভূতি

সকাল সকাল ট্রেনে চেপে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম দেওঘর (জসিডি স্টেশন)। স্টেশন থেকে বেরোতেই চারপাশের গমগম ভাব আর 'বম বম ভোলেনাথ' ধ্বনি কানে এল। বাতাসে একটা অদ্ভুত পবিত্র ও পজিটিভ ভাইব আছে, যা নিমেষেই মনকে ভালো করে দেয়।

দর্শনীয় স্থান ও আমার অভিজ্ঞতা

- **বাবা বৈদ্যনাথ ধাম মন্দির:** দেওঘরে এসে প্রথমেই গেলাম দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে। মন্দিরের চত্বরে লাল ও গেরুয়া কাপড়ের মেলা, ভক্তদের ভিড় আর মন্ত্রোচ্চারণ এক অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করে। লাইনে দাঁড়িয়ে যখন শিবলিঙ্গে জল ঢাললাম, মনের ভেতর এক অদ্ভুত শান্তি অনুভব করলাম।
- **তপোধন পাহাড়:** এরপর আমাদের গাড়ি চলল তপোধন পাহাড়ের দিকে। লোককথা অনুযায়ী, এখানে একসময় ঋষি বাল্মীকি তপস্যা করেছিলেন। এখানকার মূল আকর্ষণ হলো পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে থাকা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি পাথরের গুহা। একটা সরু গুহার ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অন্যপাশে বেরোনোর অভিজ্ঞতা ছিল বেশ রোমাঞ্চকর!
- **ত্রিকূট পাহাড়:** আমার এই ট্রিপের সবচেয়ে পছন্দের জায়গা ছিল ত্রিকূট পাহাড়। তিনটি চূড়াবিশিষ্ট এই পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এককথায় অসাধারণ। পাহাড়ের ওপরে ওঠার জন্য রোপওয়ের (Ropeway) ব্যবস্থা আছে। রোপওয়েতে চড়ে যখন ওপরে উঠছিলাম, পায়ের নিচে ঘন জঙ্গল আর দূর দিগন্তের ভিউ দেখে সত্যি চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল।
- **নন্দন পাহাড়:** বিকেলের দিকটা কাটালাম নন্দন পাহাড়ে। এটি মূলত একটি সুন্দর পার্ক এবং বিনোদন কেন্দ্র। পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যাস্ত দেখার দৃশ্যটা চমৎকার ছিল। পড়ন্ত রোদে পুরো দেওঘর শহরটাকে ওপর থেকে দেখতে দারুণ লাগছিল।
- **সৎসঙ্গ আশ্রম:** ফেরার আগে ঘুরে এলাম ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গ আশ্রমে। বিশাল বড় এই আশ্রম চত্বরের শান্ত ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ মনকে নিমেষেই শান্ত করে দেয়।

দেওঘরের বিখ্যাত স্বাদ

দেওঘর যাব আর সেখানকার বিখ্যাত **প্যারা** খাব না, তা তো হতেই পারে না! বাবা ধামের প্রসাদি প্যারা ছাড়া এখানকার গরম গরম রাবড়ি আর ছানার জিলিপি খেয়ে তো আমি এক্কেবারে ফিদা। সত্যি বলতে, ডায়েটের কথা ভুলে মিষ্টির দোকানেই বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল।

আমার দেউলটি ভ্রমণ

রূপনারায়ণের তীরে শরৎচন্দ্রের খোঁজে শহরের কংক্রিটের জঙ্গল আর গাড়ির হর্ন থেকে মুক্তি পেতে একটা ছুটির দিনে সকাল সকাল গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কোলাঘাটের কাছে ছোট্ট গ্রাম দেউলটির উদ্দেশ্যে। কলকাতা থেকে দূরত্ব মাত্র ৬০ কিলোমিটারের কাছাকাছি, তাই দু ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম একেবারে শান্ত, সুনিবিড় পল্লীপ্রকৃতির কোলে।

যাত্রা ও প্রথম অনুভূতি

বোম্বে রোড (NH-6) ধরে যাওয়ার পর যখন মূল রাস্তা ছেড়ে দেউলটির ভেতরের গ্রামের রাস্তায় গাড়ি ঢুকল, চারপাশের পরিবেশটাই বদলে গেল। দুপাশে সবুজ ধানখেত, মাটির বাড়ি আর বড় বড় পুকুর—ঠিক যেন কোনো পটুয়া শিল্পীর আঁকা বাংলার গ্রামের ছবি। দূষণহীন একদম তাজা বাতাস বুকে টেনে নিয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

দর্শনীয় স্থান ও আমার অভিজ্ঞতা

- **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কুঠির (সামতাড়েন):** দেউলটি আসার মূল আকর্ষণই হলো অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। দেউলটি স্টেশন বা মোড় থেকে কিছুটা ভেতরে 'সামতাড়েন' গ্রামে তাঁর এই দোতলা মাটির বাড়িটি অবস্থিত। বাড়িটিতে পা রাখতেই মনের ভেতর একটা অন্যরকম ভালোলাগা কাজ করছিল। এখানেই বসে তিনি ‘দেবদাস’, ‘চরিত্রহীন’ বা ‘মহেশ’-এর মতো কালজয়ী সব গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত খাট, আরামকেদারা, লেখার টেবিল আর ঘড়িটি এখনো খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে। ওনার প্রিয় সেই মাটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনে রূপনারায়ণ নদীর হাওয়া গায়ে মাখার অনুভূতিটাই আলাদা।
- **রূপনারায়ণ নদীর চর:** শরৎচন্দ্রের বাড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বয়ে চলেছে রূপনারায়ণ নদী। আমরা দুপুরের দিকে নদীর পাড়ে গিয়ে বসলাম। নদীর বিশাল চওড়া বুক আর শান্ত জল থমথম করছে। ঘাটে বাঁধা নৌকো আর দূরে মাছ ধরার দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল।
- **নিরিবিলি গ্রামের পথ:** বিকেলের দিকে কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য ছাড়াই গ্রামের মাটির রাস্তা ধরে হেঁটে বেড়ালাম। চারদিকের নিস্তব্ধতা, পাখিদের ডাক আর বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে আসা বিকেলের আলো-ছায়া মনকে এক অদ্ভুত শান্তি দিচ্ছিল। শহুরে জীবনের সমস্ত ক্লান্তি যেন নিমেষে ধুয়ে মুছে গেল।

স্বচক্ষে শুশুনিয়া দর্শন

তখন বাজে রাত্রির সাড়ে আটটা ফোন করছি প্রলয় কে, এটা জানার জন্য যে ও কখন বাড়ি থেকে বেরোবে। কারণ আমাদের আগে থেকে কথা হয়ে গেছিল যে ও আর আমি একই অটোতেই বরফ কলে পৌঁছাব। যাইহোক ও আমার কথা অনুসারে অটোর ড্রাইভারকে বলে একটি সিট ফাঁকা রেখে আমাকে ফোন করে দিল। আমিও পৌঁছে গেলাম পঞ্চানন তলায়। এরপর অটো আসার পর মা ও রুপসাকে (দিদি) বিদায় দিয়ে শুরু করলাম জীবনে প্রথমবার ফ্যামিলি ছাড়া কোথাও অর্থাৎ শুশুনিয়া পাহাড়ে যাওয়ার যাত্রা। কিছু সময় পর অটো থেকে নামলাম পামারবাজারে। ওখান থেকে পাঁচ মিনিট হেঁটে সোজা পৌঁছে গেলাম নির্ধারিত স্থানে অর্থাৎ বরফকল বাসস্টপেজে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখি কয়েকজন স্টুডেন্টই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম দেবদাস বাবুও (আমাদের স্কুলের কমার্সের টিচার) নাকি অনেক আগে এসে একটি বড় লাইট পোস্টের নিচে বসে আছেন। ওনার সাথে কথোপকথনে জানতে পারলাম যে উনি এবং আরো তিনজন শিক্ষক (গৌতম বাবু, রাজু বাবু, ছাত্রবন্ধু স্যার/কৃষ্ণপদ বাবু) আমাদের সাথে হাওড়া স্টেশনে যাবেন এবং বাকি তিনজন (বিধান বাবু, শর্বরী বাবু এবং সৌরভ বাবু) ডাইরেক্ট হাওড়া স্টেশনে চলে যাবেন। যাই হোক সময় অনুসারে সকল স্টুডেন্ট (যদিও সকলে না, কিছু জন নিজেদের গার্জেনদের সাথে পৌঁছেছিল হাওড়া স্টেশনে) পৌঁছে গেল বরফকলে এবং আমরা নিজেদের গ্রুপ অনুসারে ভাগ হয়ে গেলাম। আমি ছিলাম গ্রুপ Bতে। আমরা 24 নাম্বার বাসে উঠে সোজা পৌঁছে গেলাম হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে আমাদের গ্রুপ লাইন করে দেবদাস বাবুকে ফলো করতে করতে একে একে ঢুকে পড়লাম হাওড়া স্টেশনে, নিউ কমপ্লেক্সে। এবার সময় হলো ক্যামেরাবন্দি হওয়ার মুহূর্ত, আমরা সকল স্টুডেন্ট এবং স্যারেরা দাঁড়িয়ে পড়লাম আমাদের স্কুলের পতাকাটি সামনে রেখে। স্মৃতি হিসেবে ফটো তুলে নেওয়া হোল। ফটোটি তুলে দিয়েছিলেন অভিরুপের বাবা। এবার যথাসময়ে ট্রেনে ঢুকে পড়ল ১৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আমরাও যে যার গ্রুপ অনুসারে নির্দিষ্ট কামরায় উঠে পড়লাম, আমার দিল S-10। উঠে এবার শুরু হল সিট খোঁজার পালা, যে যার সিট নাম্বার অনুসারে বসে পড়ে কিন্তু সমস্যায় পড়ে ৪ জন স্টুডেন্ট এবং আমিও তার মধ্যে দিলাম। যাইহোক অনেক কথোপকথনের পর আমরা নিজেদের মধ্যে ম্যানেজ করে বসে গেলাম। আমি চলে গেলাম S-10 থেকে S-9-এ, সেখানে আমার সাথে ছিল আমাদের ঘুমকাতুরের স্যার দেবদাস বাবু (সরি স্যার একটু মজার জন্য লিখলাম) এবং আরো তিনজন বন্ধু। এবার শুরু হলো আসল মজা, যা গত এক সপ্তাহ ধরে মনে মনে হচ্ছিল। যাই হোক এবার যে যার খাবার বের করে রাতের খাবার সেরে নিলাম। আমি খেলাম মায়ের হাতের তৈরি চাওমিন। দেবদাস বাবুও বাকি স্যারেরা খেয়ে নিল রুটি-আলুর দম। কিন্তু এর পরেও, দেবদাস বাবুর খিদে না মেটায় তিনি শুরু করলেন, বেঁচে থাকা আলুর দমের সাথে মুড়ি খাওয়া এবং ওনার সাথে কথোপকথনে জানতে পারলাম যে ওনার বাড়ি মেদনীপুরে। আরো অনেক কথোপকথন হলো। এবার সময় হল ঘুমোনোর, আমাদের সাথে যারা সহযাত্রীরা ছিলেন তারা লাইট টাইট বন্ধ করে সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন এবং সাথে সাথেই দেবদাসও বাবু শুয়েই নাক ডাকতে শুরু করে দিলেন, সেটা অবশ্য সহানীয়। কিন্তু কে এক ব্যক্তি, এত জোরে নাক ডাকছিলেন যে আমার পক্ষে ঘুমানোটা অসম্ভব হয়ে গেল। যাইহোক আনন্দের জন্য ঘুমও আসছিল না, তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তখন রাত একটা, নেমে পড়লাম আপার সিট থেকে, তারপর চলে গেলাম শর্বরীবাবুদের কাছে। তারপর অনেক

কথা বললাম এবং একটু জানলা দিয়ে হাওয়া খেলামা রূপনারায়ণ নদী ও কোলাঘাটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জানলা দিয়ে দেখলাম। যখন রাত্রির দুটো বাজলো, চোখে অল্প অল্প ঘুম এলো, চলে গেলাম নিজের সিটের দিকে কিন্তু আর ঘুমাতে পারলাম না। অর্পনের সাথে সাথে গল্প জুড়ে দিলাম। শেষে পাহাড়ে ওঠার কথা মাথায় রেখে তিনটের সময় চলে গেলাম ঘুমতে। ঘুমিয়ে নিলাম চারটে অব্দি, ফোনের এলার্মটি বাজতে উঠে পড়লাম। উঠেই দাঁত মেজে, চোখ মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। মনে যেন এক অন্যরকম আনন্দের অনুভূতি জাগলো। এবার যথাসময়ে ট্রেনটি এসে থামল আমাদের গন্তব্য স্টেশন "দাতনা"। সেখানে সবাই সবার মতো ব্যাগ থেকে খাবার (বিস্কুট) বের করে, কেউ আবার চা কিনে খেতে লাগলো। আমিও আমার ব্যাগ থেকে একটি বিস্কুটের প্যাকেট বের করে খেতে লাগলাম। কিছু সময় স্টেশনে থাকার পর স্যাররা ভাড়া করলেন চারটি টেকার (গ্রামের রাস্তায় চলে)। সেগুলি করে আমরা চলে এলাম আমাদের শিক্ষকদের ভাড়া করা" জুন & মুন ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট" এ এবং এরই পাশের রাস্তা ধরে হটিতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম পলাশ ফুলের বনে। সেখানে অনেক ফটো, অনেক সেলফি তুলে নিলাম এবং বিশেষ করে বিধান বাবুর ফোনে তোলা গ্রুপ ফটোগুলো ছিল ব্যাপক। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ফটোগুলো তুলে দেওয়ার জন্য। যখন ঘড়িতে বাজলো সকাল সাড়ে সাতটা আমরা আবার ফিরে গেলাম রেস্টুরেন্টে। সকলে টিফিন সেরে নিলাম। মেনু ছিল গরম গরম ফুলকো আটার লুচি, অসাধারণ স্বাদযুক্ত আলুর চচ্চড়ি এবং একটি করে ডিম সিদ্ধ। খাওয়া-দাওয়া সারার পর এবার রওনা দিলাম পাহাড় জয়ের উদ্দেশ্যে। অবশেষে অবসান হলো দীর্ঘ অপেক্ষার। পাহাড়ে ওঠার সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান দিল না তাই বিধান বাবু আমাদের বুঝিয়ে দিলেন পাহাড় চড়ার সময় কি কি করণীয় ও কর্তব্য। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি হল জল সঙ্গে রাখা। আমি 1 লিটার করে দুটি জলের বোতল নিয়ে রওনা দিলাম পাহাড়ে। একটা কথা এখন বলে রাখি সেটি হল আমাদের সাথে বিধান বাবুর বয়সের অনেকটা ডিফারেন্স হলেও আমরা (আমি) বিধান বাবুর কাছে একটা বয়স্ক মানুষ। এটি বলার কারণ পরে ব্যাখ্যা করব। সকল শিক্ষক এবং ছাত্ররা মিলে শুরু করলাম শুশুনিয়া পাহাড় চড়া। কিন্তু, প্রথম প্রথম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠা সহজ লাগলেও কিছু পরে সেটি হয়ে ওঠে অত্যন্ত কঠিন। সবাই সবার মতো ছড়িয়ে পড়লাম, কেউ গেল পিছিয়ে, কেউ গেল এগিয়ে। কিন্তু বিধান বাবু হনহনিয়ে উঠে গেলেন উপরের দিকে। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম নাআমি কোনখানে। যাই হোক দু মিনিট করে বসছি এবং পাঁচ মিনিট করে পাহাড় চড়ছি। মাঝখানে কিছু মুহূর্তের জন্য মনে মনে ভাবছিলাম যে হয়তো আর উঠতে পারব না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মাথায় ঘুরছিল দুটি কথা যথা- (১) আমি যদি এতটা পথ পাড়ি দেওয়ার পরেও পাহাড়ের শীর্ষে না পৌঁছতে পারি তাহলে নিজেকে ব্যর্থ মনে হবে এবং (২) বিধান বাবু যদি উঠতে পারে তাহলে এটা আমার পক্ষে ও অসম্ভব নয় (সরি স্যার, এই কথাটা সত্যি আমার মাথায় এসেছিল তাই লিখলাম)। অতএব মনস্থির করে নিলাম, পরের শীর্ষ অবধি না পৌঁছে বাড়ি ফিরছিনা। শুরু করলাম আবার যাত্রা এবং এখনো অবধি বাধা দিল, কেবলমাত্র বৃহদাকার বোল্ডার কিন্তু এবার সম্মুখীন হলাম সাপ এবং বাঁদরের কিন্তু ওই যে মনস্থির করে নিয়েদিলাম পাহাড়ের শীর্ষে না পৌঁছে বাড়ি ফিরছি না। অতএব নিজেকে করা প্রতিশ্রুতি রাখতে বাধার সম্মুখীন হওয়ার সত্ত্বেও পাড়ি দিলাম পাহাড়ের শীর্ষের দিকে। অনেক কষ্টের পর অবশেষে পৌঁছালাম উপরে অর্থাৎ পাহাড়ের শীর্ষে। কথাটা বলা অনেক সোজা হলেও করাটা অত সোজা নয়। মনে হচ্ছিল মনের ভিতরে বাসা বেধে থাকা এক সপ্তাহের সেই অর্থ জলন্ত আনন্দের শিখাটি সম্পূর্ণভাবে জ্বলে উঠলো অর্থাৎ এত কষ্ট করে আসার পর সেই অসম্পূর্ণ আনন্দটি সম্পূর্ণ হল। পৌঁছে দেখি বিধান বাবুরা ফিরে আসছেন। আমার ওঠার প্রায় কুড়ি মিনিট আগেই ওনারা পৌঁছে গেছেন। এটিই ছিল নিজেদেরকে (বিশেষ করে নিজেকে) বিধান বাবুর পাশে বয়স্ক বলার কারণ। যাই হোক স্যারের থেকে

পারমিশন নিয়ে একদম পাহাড়ের প্রান্তে যেখানে ছিল প্রকৃতির অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য সেখানে পৌছালাম। স্থানটি দেখার পর এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে পড়লো, প্রাবন্ধিক বেগম রোকেয়ার রচিত" হিমালয় দর্শন' প্রবন্ধের উক্তিটি "আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি"। অপূর্ব, অসাধারণ, অকল্পনীয়, যাই অলংকারিক শব্দ ব্যবহার করিনা কেন সেটাও কম পড়বে। সেখানে আমি এবং দুই দেবাংশু ছাড়া (দেবাংশু পাল এবং দেবাংশু) আরেক ব্যক্তি অলরেডি সেখানে বসেছিলেন সেটি আর কেউ না স্বয়ং হনুমান বাবাজি। বসে বসে আগে আসা স্যার এবং স্টুডেন্টদের থেকে পাওয়া কিছু খাবার খাচ্ছিলেন এবং খাবারগুলি দিল শেষের মুখে। আমরা এবার একে একে শুরু করলাম পোজ দিয়ে ফটো তোলা। এদিকে মনের মধ্যে ভয় যদি বাঁদর এক্ষুনি তাড়াকরে! ওদের হাতে পড়লে আর নিস্তার নেই। যাই হোক ভয়ে ভয়ে দু'চারটে ফটো তোলা শেষ। আর সেই সময় আক্রমণ বাঁদরের আমরাও দিলাম দৌড় দিলাম নিচের দিকে। গিয়ে দেখি বিধান বাবুরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, তাই একত্রিত হয়ে আবার নিচের দিকে রওনা দিলাম। কিছু পথ নেমে আমরা আবার একটু জিরিয়ে নিলাম। নিচে নামাটাও কঠিন ছিল কিন্তু ওপরে ওঠা অপেক্ষা অনেক কম। অনেকটা নেমে একটি গাছের পাতায় ঢাকা সামান্য সমতল ভূমিতে বসলাম। বিধান বাবু আরো দুটো ফটো ক্লিক করে নিলেন। সেখানকার একজন স্থানীয়ের থেকে শুনলাম যে কুড়ি পঁচিশ জন নাকি অলরেডি নিচের দিকে নেমে গেছে শর্টকাট ধরে আমরাও সেই শর্টকাট ধরে নামতে শুরু করলাম। আমি সেখান থেকে বিধান বাবুর কথামতো দুটি পাথর কুড়িয়ে নিলাম স্মৃতি হিসেবে। আরও কিছু পথ নামার পর একটি তেঁতুল গাছের নিচে বসে একটু জিরিয়ে নিলাম। আবারও শুরু করলাম যাত্রা নিচের দিকে, অবশেষে এসে পৌঁছালাম একেবারে নিচে। সেখান থেকে একটি ঠান্ডা জলের বোতল কিনে জল খেয়ে গলাটিকে শান্তি দিলাম। ওখান থেকে সামনে একটি পলাশ বনে গেলাম, বিধান বাবুর ফোনে পলাশ ফুলের একটি ফটোশুট করতে শুরু করলাম। সেটি কমপ্লিট হলে সোজা রেস্টুরেন্টে পৌঁছালাম। গিয়ে দেখি গৌতম বাবু রেস্টুরেন্টের একটি ঘরে পাতা খাটিয়াতে বসে আছেন। তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত, সাথে আমরাও। ভাই একটু জিরিয়ে নিলাম। আমি আমার ঘর্মাক্ত শার্টটা খুলে ব্যাগ থেকে আরেকটি শার্ট বের করে গায়ে গলিয়ে নিলাম। ওখানকার একটি জলের বেসিন থেকে জল দিয়ে মাথা-হাত-মুখ ধুয়ে ব্যাগে করে নিয়ে আসা একটি টাওয়াল দিয়ে হাত পা মুছে, আবার একটু জিরিয়ে নিলাম। এবার আস্তে আস্তে মনটা খারাপ হতে লাগলো। ফিরে যেতে হবে সেই একই জীবনে। যাইহোক কিছু সময়ের জন্য হলেও এই আনন্দটা ছিল অতুলনীয়, যেটা লিখে বোঝানো হয় তো অসম্ভব হবে। এবার একে একে সবাই ফিরে এলো বাকি স্যারেরাও । কিছু সময় পরে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শুরু হয়ে গেল। আমি প্রথম ব্যাচেই বসে পড়লাম কিন্তু তখনও খিদে পায়নি, কিন্তু যেহেতু বাড়ি যেতে হবে তাই অর্পণকে নিয়ে বসে পড়লাম খাবার টেবিলে। মেনু ছিল বেশ ভালো! যথা ভাত, ডাল, বাঁধাকপির চচ্চড়ি, আলু চোখা, মুরগির মাংস, চাটনি, পাপড়। খাবারের স্বাদ ছিল অতুলনীয়। খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে এবার ব্যাগটাকে নিয়ে বসে পড়লাম বাড়ি যাওয়ার অপেক্ষায়। আরেকটা ব্যাচ বসলো তাদের মধ্যে প্রত্যেকটা স্যার বাকী কিছু জন ছাত্র ছিল। অবশেষে সবকিছু সম্পূর্ণ হলো সবাই রেডি হয়ে গেলাম বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে। এবার যেন দুঃখটা ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। তবুও দিনের শেষে ঘর হল আমাদের প্রকৃত শান্তির জায়গা। আগে থেকে বলে রাখা টেকার গুলো চলে এলো, আমরাও উঠে পড়লাম। কিছু জন আবার ট্রেকারের মাথার উপরে চড়ে বসল। শুরু হলবাড়ি ফেরার পালা, মন খারাপের পালা। ট্রেকার থেকে দুপাশে এক মনোরম দৃশ্য। আর মনে মনে শুশুনিয়াকে জানাচ্ছিলাম বিদায়, আবার হয়তো কোনদিন দেখা হবে না। পৌঁছে গেলাম "দাতনা" স্টেশন। সেখানে গিয়ে স্যারেরা আমাদের নিজেদের সিট নাম্বার বুঝিয়ে দিলেন, ট্রেন ছিল, ওটে 31 মিনিটে কিন্তু ট্রেনটি

প্রায় অনেকক্ষণই লেট করে ঢুকলো, তারই ফাঁকে আমাদের স্কুলের কিছু স্টুডেন্টরা বক্সে গান চালিয়ে নাচতে শুরু করল আর সেই দৃশ্যের বিধান বাবু ভিডিও করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার মনটা একটু খারাপই দিল, মনে হচ্ছিল একটা দিন থেকে বড় ভালো হতো। যাই হোক সেসব কথা ভেবে লাভনেই, বাড়িতে তো ফিরতে হবে? ট্রেনও এসে ঢুকলো দাঁতনা স্টেশনে, উঠে পড়লাম একে একে সবাই। যে যার সিট খুঁজে বসে পড়লাম। আমি বসে দিলাম জানলার ঠিক পাশে তাই, ট্রেনের দুলুনি আর ঠান্ডা হাওয়া খেতে খেতে চোখ দুটো জুড়িয়ে এলো, কখন ঘুমিয়ে পড়লাম নিজেই জানিনা। ঠিক একঘন্টা পরে চোখ খুলে দেখি কেউ ভিডিও করছে, কেউ খাচ্ছে, কেউ ফোন দেখছে, আবার কেউ ঘুমাচ্ছে। আমিও আমার মত নিজের ফোনে তোলা ফটোগুলি এবং অন্যদের গ্রুপে পাঠানো ফটোগুলি দেখতে লাগলাম। হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিতে লাগলা। একটি ঝাল মুড়িওয়ালার থেকে মুড়ি কিনে খেতে শুরু করলাম। এবার কিছুক্ষণ ট্রেন চলার পর, শুরু হলো আর এক সমস্যা। ট্রেনটা এসে সেই যে থামলো একটা স্টেশনে আর চলেই না। অতএব ট্রেন লেট করল আড়াই ঘন্টা। একে একে সবার বাড়ি থেকে ফোন আসছে কিন্তু এই সমস্যাটা আমার কাদ্দে খুব সামান্যই মনে হয়েছিল কারণ সব বন্ধুরা মিলে একসাথে গল্প, নাচ, খেলা (ফ্রী ফায়ার, উনো) ইত্যাদি করতে করতে সময় কেটে যাচ্ছিল। অবশেষে ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। অবশেষে গন্তব্য স্টেশনে সাঁতরাগাছি নামলাম। ওখান থেকে এস্কেলেটর করে রেললাইন পার করে সোজা চলে এলাম বাসস্ট্যান্ডের সামনে। ওখান থেকে গৌতম বাবুর সঙ্গে ধরলাম ধর্মতলার বাস, ধর্মতলায় নেমে শুরু হলো রাসমণি বাজারের বাসের খোঁজ। যাই হোক পরে যারা বাসে করে আসছিল (আমরা ভাগ হয়ে গিয়েছিলাম) তাদেরকেই পেয়ে গেলাম। তাদের সাথে উঠে পড়লাম একই বাসে। এবার আমি ও আমার কিছু বন্ধুরা মিলে নেমে পড়লাম শিয়ালদহ স্টেশনে। সেখান থেকে অটো ধরে সোজা বাড়ি। রাতে মায়ের হাতের অপূর্ব ডিমেরকারী আর ভাত খেয়ে নিজেকে বিছানার সাথে মিশিয়ে দিলাম।।